সুধীরকুমার মিত্র : আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার নব রূপকার

জন্মশতবর্ষে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১. প্রসঙ্গকথা

বাঙালিকে অনেকে ইতিহাস-বিস্মৃত জাতি বলতেন। এমনকি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও খেদ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে বাঙালির ইতিহাস লেখার আগ্রহ নেই। ধীরে ধীরে গোটা বিংশ শতাব্দী জুড়ে বাঙালির সেই অপবাদ ঘুচেছে। সামগ্রিক বঙ্গে ইতিহাস লেখক হিসাবে আমরা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অনেককেই পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি সতীশচন্দ্র মিত্র, রজনীকান্ত গুপ্ত, চণ্ডীচারণ সেন, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, রাধারমণ মিত্র প্রমুখ আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষকদের সঙ্গে অবশ্যই সুধীরকুমার মিত্রকে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় সুধীরকুমার মিত্র। স্বাধীনতার পরে পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে সুধীরকুমার মিত্র পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন হুগলির গ্রাম থেকে গ্রাম। তখন জেরক্স মেশিন নেই, টেলিফোন নেই, সব জায়গায় পরিবহন ব্যবস্থার এত উন্নতি হয় নি। তবু সুধীরকুমার মিত্র ধূলিধূসরিত পথে ঘুরে ঘুরে লিখে গেলেন হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ। সাধারণ ক্যামেরায় তুললেন ছবি। সবই নিজের খরচে। টানা পাঁচ বছর ধরে নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহান্তে হুগলি জেলার প্রতিটি মহকুমায় ঘুরে ঘুরে প্রায় আঠারোশো গ্রাম পরিক্রমা করলেন তিনি। আঞ্চলিক ইতিহাস বিস্তৃত পর্যায়ে কিভাবে লিখতে হয় এবং কিভাবে দীর্ঘস্থায়ী করতে হয়, তা সুধীরকুমার শিখিয়েছিলেন। মহাফেজখানার বাইরে, পাঠকক্ষের বাইরে গিয়ে চাক্ষুষ ও লৌকিক ইতিবৃত্তের সন্ধান করা সুধীরকুমার মিত্রের প্রথম ব্যতিক্রমী কাজ ছিল।

সুধীরকুমার মিত্রের জন্ম হয় ১৯০৯ সালে ৫ই জানুয়ারি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন হুগলি জেলার জনাই - বাকসা গ্রামে মামার বাড়িতে। পৈতৃক বাড়ি হুগলি জেলার হরিপাল থানার জেজুরা গ্রামে। তিনি জেজুরের বিখ্যাত মিত্র বংশের সন্তান। পিতা আশুতোষ মিত্র, মাতা রাধারাণী দেবী। মাতৃকুলও ছিল ঐতিহ্যবাহী বংশ। দাদামশাই গুরুদাস সিংহ ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। বিজ্ঞানের ছাত্র সুধীরকুমার আকৃষ্ট হয়েছিলেন ইতিহাসে। আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর তাঁর প্রথম পুস্তক 'জেজুরের মিত্র বংশ' এবং 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ' -এর পাশাপাশি আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর তাঁর আরেকটি বিখ্যাত বই 'তারকেশ্বরের ইতিহাস।' আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার পাশাপাশি তিনি লিখেছেন অবিস্মরণীয় বিপ্লবীদের জীবনী। রাসবিহারী বসু, কানাইলাল দত্ত, বাঘা যতীন, প্রফুল্ল চাকী ও সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর লেখা সেইসব জীবনীগ্রন্থ এবং পরাধীন ও স্বাধীন ভারতে তাঁর জীবনচর্চা এবং জীবনযাপন প্রমাণ করেছিল যে দেশপ্রেম ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার পূর্ব শর্ত হল অঞ্চলকে অনুধাবন করা এবং নিরন্তর অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণমর্মরকে খুঁজে বার করা, তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতকে বুঝতে পারা এবং তাকে উপস্থাপিত করা। সুধীরকুমারের সেই উপস্থাপনা বাংলা ভাষায় বিস্তৃত লৌকিক গবেষণার দিগন্তকে উন্মোচিত করেছে।

সুধীরকুমারের লিখনশৈলী ও তথ্য অনুসন্ধান

সুধীরকুমারের লিখনশৈলীর কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর লিখনশৈলী ছিল সহজ, সরল। সাধু ভাষায় ছোট ছোট বাক্যে নিরাসক্ত আত্মকথনের ভঙ্গিতে তিনি বাঙালিকে ইতিহাস লিখতে শিখিয়েছিলেন। কোথাও মতাবাদের উগ্রতা ছিল না। ব্যঙ্গ ছিল না, কৌতুক ছিল। তিনি পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু ঋণ স্বীকারের দায়িত্বকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। নিশীথরঞ্জন রায় তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, সুধীরকুমার সব ধরনের তথ্য - উৎসকে ব্যবহার করেছেন এবং এর মধ্যে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ও দিনেমারদের সূত্রে যে সব উপাদান আছে, তিনি তা'ও ব্যবহার করেছিলেন। বিদেশীদের আঁকা মানচিত্র থেকে আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। তিনি যখন গবেষণা করছেন, তখন ঐ সব উপাদান সংগ্রহ করা খুব সহজ ছিল না। তথ্যের উৎসের সন্ধান থাকতো তাঁর লেখায়। ফলে আরও চাক্ষুষ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো তাঁর লেখা। উত্তরসূরিরাও দিশা পেতেন। কিন্তু অনেকেই তাঁর ঋণ স্বীকার করেন নি। হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে সুধীরকুমার মিত্র কৌতুকের সঙ্গে লিখেছিলেন, ''এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর কেউ কেউ নিরুদ্বেগে তা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে নানান রচনা লিখে ঋণ স্বীকারের দায় বা দায়িত্বকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু কৌতুকের ব্যাপার এই যে 'যদ্দৃষ্টং তৎ লিখিতং' পদ্ধতির অনুসরণ করে আমার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে যে বিচ্যুতি ছিল, এই সমস্ত লেখকবৃন্দ তাঁদের মৌলিক গবেষণাতেও সেইসব ভুলগুলি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। বর্তমান সংস্করণে আমি আগের ভুলগুলি সংশোধন করেছি। তাঁরাও যদি সেই ভুলগুলি সংশোধন করে দেন, তাহলে ইতিহাসের শরীর অক্ষত থাকে।'' এ থেকে বোঝা যায়, পেশাদার গবেষকরাও তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। কিন্তু ঋণ স্বীকারের শিষ্টাচার দেখান নি কিছু গবেষক।

গ্রাম গবেষণা ও অন্য কথা

লৌকিক ইতিহাস - চর্চায় 'গ্রাম' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। নিশীথরঞ্জন রায় উল্লেখ করেছিলেন, সুধীরকুমার মিত্র ছিলেন গ্রাম গবেষণার পথিকৃৎ। একটি জেলার এত অসংখ্য গ্রামের ইতিহাস লেখা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। তৃণমূল পর্যায়ে উপাদান সংগ্রহ এবং লোক - সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করে ইতিহাস লেখা তাঁর আগে

বিশেষ দেখা যায় নি। এ বিষয়ে তাঁকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পেরেছিলেন রাধারমণ মিত্র। সুধীরকুমার মিত্র হুগলি জেলার দেবদেউল নিয়ে যেমন লিখেছিলেন, তেমনই লিখেছিলেন দক্ষিণ ভারতের দেবমন্দির নিয়ে। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ''দক্ষিণের দেবস্থান।'' বঙ্গ ভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের (১৩৪৮, বৈশাখ) প্রথম অধিবেশনের বক্তৃতায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে তিনি বলেছিলেন, ''আমাদের মাতৃসমা মাতৃভাষার সংস্কার করিতে হইবে।'' আরও বলেছিলেন, ''এখানে ভাবকে বহন করাই ভাষার একমাত্র প্রয়োজন। সুতরাং ভাষা ভাবের বাহন।'' সুতরাং ভাব ও ভাষা , বিশেষত মাতৃভাষার উপর তিনি প্রচ্ছন্ন অনুরাগ বর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু ইংরাজি ভাষাকে তিনি ছোট করেন নি। সুধীরকুমারের ইংরাজি ভাষায় রচিত 'Society, Culture and Religion of Bengal'বিখ্যাত গ্রন্থ।

।। দ্বিতীয় পর্ব।।

সুধীরকুমার মিত্রের আঞ্চলিক ইতিহাস - চর্চার পদ্ধতি দেখে নিম্নবর্গীয় ইতিহাস রচনার ধারা মনে পড়ে। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে এবং অবশ্যই সেটি যৌথ সংস্কৃতি নয়। কিন্তু যৌথ সংস্কৃতির উপাদান। সেটি প্রান্তীয় সংস্কৃতি (Marginal Culture) । এই প্রান্তীয় সংস্কৃতির আদিরূপ এবং বিকশিত রূপ দুটিই সভ্যতার প্রবাহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ' লিখতে গিয়ে সুধীরকুমার একটি জেলার ইতিহাসের ভেতরেও প্রান্তিক ইতিহাস - চর্চার খোঁজখবর চালিয়েছেন। প্রধানত মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের অনেকখানি ইতিহাস তিনি লিখতে পেরেছেন জেলার ইতিহাসের ভিতরে। ফলে বুঝতে পারা গেছে, বাংলার ইতিহাসের মৌল ধারার মধ্যে কোথাও ঐ প্রান্তিক ধারাটির অবস্থান ছিল। 'জেজুরের মিত্রবংশ' বইটির ভেতরে এর ছায়াপাত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইটি পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

হুগলি জেলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড শুরু হয়েছে প্রাচীন বাঢ়দেশের বিকরণ দিয়ে। এখানে বহু নদীর কথা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকৃতি পরিচয়ে রয়েছে ধানের কথা, তুলার চাষের কথা, কাঁঠাল, আলু চাষ সহ কৃষকদের কথা, বিভিন্ন বাণিজ্য দ্রব্যের 'তালিকা। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে সামাজিক বিবরণ। এই সামাজিক বিবরণে রয়েছে ধর্মীয় ও সামাজিক নানা দিক। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বহু তথ্য রয়েছে এখানে। সংস্কৃতির ভেতরকার বীভৎস সামাজিক প্রথাগুলির উল্লেখও রয়েছে। এই বীভৎস সামাজিক প্রথার উল্লেখ বিশেষ জরুরী। লোকসংস্কৃতির ক্ষয়কারী দিকটি তাতে পরিস্ফুট হয়। একটি তথ্য এখানে বিস্ময় উদ্রেক করে। সেটি হল হুগলি জেলার ব্রতকথা। হুগলি জেলার কোন কোন ব্রতের অনুষ্ঠান হতো, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে যাতায়াত - ব্যবস্থা এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিক্ষা - ব্যবস্থা, সপ্তম অধ্যায়ে সাহিত্য প্রসঙ্গ এবং অষ্টম অধ্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হযেছে। একেবারে শেষে রয়েছে সেকালের চুঁচুড়ার ইতিহাস। আঞ্চলিক ইতিহাস বিস্তৃত পটভূমিতে কিভাবে লিখতে হয়, তা খুব সহজে দেখানোর পর সুধীরকুমারের লিখনরীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন অনেকে। রমেশচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, দীনেশচন্দ্র সরকার, হরিহর শেঠ, নিশীথরঞ্জন রায়, প্রভৃতি গবেষকদের সাধুবাদ প্রমাণ করেছিল যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে আঞ্চলিক ইতিহাসের চর্চার একটা নবজন্ম হতে চলেছে। স্বাধীনতার পরেই এ ধরনের স্বদেশচেতনার প্রয়োজন ছিল। শুধু লেখা নয়, প্রচুর ছবি হুগলি জেলার ইতিহাসে। এরপর কয়েক বছরের মধ্যে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে। এখানেও গ্রাম ধরে, স্থান নাম ধরে এবং তারপর থানা ধরে পরপর যেন ইতিহাস তিনি লিখেছেন, তাতে অসংখ্য তথ্য রয়েছে। ইতিহাসবিদ র‍্যাঙ্কের পদাঙ্ক এক অর্থে তিনি অনুসরণ করেছিলেন। সমস্ত তথ্য তিনি সাজিয়ে রেখে গেছেন পরবর্তী গবেষকদের জন্য। এক্ষেত্রে যে সব তথ্যের উপর তিনি নির্ভর করছেন, তা ক্রমান্বয়ে সাজালে দেখা যায়, তিনি (১) বিভিন্ন ডায়েরি, যেমন উইলিয়ম হেজের ডায়েরি, (২) মঙ্গলকাব্য, (৩) প্রাচীন সাহিত্য, (৪) জেলা গেজেটিয়ার, (৫) বিভিন্ন প্রাচীন পুস্তক, (৬) পুঁথি, (৭) মন্দিরে মন্দিরে উৎকীর্ণ শ্লোক, (৮) মসজিদে উল্লিখিত লিপিমালা, (৯) দলিল দস্তাবেজ (১০) মানচিত্র, (১১) শাস্ত্র, (১২) স্মৃতিচিত্র, (১৩) খবরের কাগজ, (১৪) পাথরের ফলক লিপি, (১৫) পোড়ামাটির কাজ, (১৬) জনশ্রুতি, (১৭) বিভিন্ন গ্রামকথা, (১৮) হ্যান্ডবিল, (১৯) চাক্ষুষ বিবরণী ও সাক্ষাৎকার এবং সরকারি ইস্তেহার প্রভৃতি প্রামাণ্য দলিলের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

একটি জেলার বিভিন্ন গ্রামের নানা ঘটনা ক্রমান্বয়ে লিখে যাবার ফলে ইতিহাস রক্ষা পেয়েছে। আজ ২০০৮ সালে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে, ঐসব গ্রামগুলির পুরনো গঠনবৈশিষ্ট্য যা উল্লেখ করেছিলেন শ্রীযুক্ত মিত্র, তা আর অবশিষ্ট নেই। বহু স্থাপত্যভাস্কর্য লুপ্ত হয়ে গেছে। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিনাশ ঘটেছে বহু ক্ষেত্রে। সুধীরবাবু লিখে না গেলে আজ হুগলি জেলার অতীত ইতিহাস সে ভাবে রচিত হতো না। এটা ঠিক যে শম্ভুচন্দ্র দে বা ক্রফোর্ড এবং টয়েনবি হুগলি জেলার ইতিহাস লিখেছিলেন। জেমস লঙও ভাগীরথী নদীতীরে ইতিহাস লিখে হুগলি জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন Calcutta Review -তে। কিন্তু সুধীরকুমার মিত্র নিম্নবর্গের অবস্থান থেকে, তৃণমূল স্তর থেকে হুগলি জেলার ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করেছিলেন। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা মতপ্রতিষ্ঠা তাঁর অন্বিষ্ট ছিল না। টায়েনবীর লেখা A brief administration of the Hooghly District, Crawford-এর লেখা হুগলি মেডিক্যাল গেজেটিয়ার হান্টারের ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার, স্ট্যাটিসটিকাল এ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল, অম্বিকাচরণ গুপ্তের লেখা হুগলি বা দক্ষিণরায়, শম্ভুচন্দ্র দে'র 'হুগলি পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট' প্রভৃতি পুস্তককে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন সুধীরকুমার তথ্যের প্রাচুর্যে এবং তৃণমূল স্তরের ইতিহাসে লেখার আগ্রহে। এ বীজ অবশ্যই লুকিয়েছিল 'জেজুরের মিত্রবংশ' নামক গ্রন্থের মধ্যে। কায়স্থ পত্রিকা (পাক্ষিক), চন্দননগর (সাপ্তাহিক) প্রভৃতি পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি

প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে কাজেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ১৯৩৩ সালে হরিজনদের নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। সেখানেও দেশের তৃণমূল স্তর ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু গান্ধীজী পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহ দেখান নি। ফলে বিফল মনোরথ সুধীরকুমার পত্রিকা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে গান্ধীজী পরে নিজেই হরিজনদের উপর পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ২০০৪ সালের ৫ই জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকার 'কলকাতা কড়চা'য় লেখা হয়েছিল তাঁর অমানুষিক প্রচেষ্টার কথা যা যে কোন ঐতিহাসিকের জীবনে অবিশ্বাস্য এক ঘটনা। তা হল, তিনি পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলেন কুড়ি হাজার গ্রাম, ইংরেজি ও বাংলায় লিখেছিলেন ৬০০ প্রবন্ধ এবং ৪০টির মতো বই। ইতিহাস লেখার তাগিদে কুড়ি হাজার গ্রাম ঘোরা এবং ৩৯ বছর বয়সে ১,১০০ পাতার 'হুগলি জেলার ইতিহাস' লিখে ফেলা অসীম শক্তির পরিচয় কোনো সন্দেহ নেই। বহু উৎসমুখ খুলে গেছে এই জেলার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। কোথায় পুরনো বাংলায় বেঁচে ছিল মানুষ, হুগলি নদীর জলধারায় কতো উদয় ও অস্তের সমারোহ ছিল। হুগলি জেলার মানুষ কিভাবে মেলা ভেঙে বাড়ি ফিরেছিল, কিভাবে তারা বসিয়েছিল মেলা, কোথায় গড়ে উঠেছিল মন্দিরের সারি, কোথায় শোনা গিয়েছিল কীর্তনের ঘন ঘন শব্দ — এইসব ইতিহাসের স্বর কান পাতলে শোনা যাবে সুধীরকুমারের লেখনী লীলায়।

বাংলায় এখন এমন ঐতিহাসিক কোথা?

কেন্দ্র থেকে প্রান্ত...

সুধীরকুমার মিত্রের কেন্দ্র থেকে প্রান্তিক ইতিহাসচর্চার আর একটি উদাহরণ 'তারকেশ্বরের ইতিবৃত্ত'। তাছাড়া হুগলি জেলার দেবদেউলের কথাও স্মরণীয়। স্মরণীয় 'শ্রীচৈতন্য কড়চা'। 'আনাল' ইতিহাসবিদেরা যেমন সর্বব্যাপ্ত তথ্যের অনুসন্ধান করে ভূগোল ও ইতিহাসের সীমারেখা খুঁজে ইতিহাস রচনার কথা বলতেন। সেই আনালিস্ট ধাঁচের ইতিহাস রচনা তারকেশ্বরের ইতিবৃত্তের ভেতর পাওয়া গেছে। ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় তারকেশ্বরের ইতিবৃত্ত। এই বইটিতে একটি ছোট অঞ্চলের বৃত্তকে ধরে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের অনুসন্ধান করা হয়েছে। লাদুরি (Laduri) যেমন ফরাসি দেশের অখ্যাত নামের বিবরণ দিতে দিতে তাকেও ফরাসি বিপ্লবের মূল ইতিহাসের গতির সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন। তারকেশ্বরের দোল উৎসব ও গাজন অংশটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সুধীরকুমার কিছু অজানা তথ্য দিয়েছেন এবং ওম্যালি সাহেবের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। নিম্নবর্গের মানুষ কিভাবে আত্মিক সমন্বয় করে গাজনের ভিতর দিয়ে, তা পরিস্ফুট হয়েছে তার লেখায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সুধীরকুমার মিত্র তাঁর প্রতিটি লেখার তথ্যের উল্লেখ করেছেন, ঋণ স্বীকার করেছেন এবং লেখার উৎসে থেকে field work বা ক্ষেত্রসমীক্ষা। একটি বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গবেষণা শেষ হয় নি। পরবর্তী সংস্করণের আবার নূতন তথ্য পেলে তা'ও সন্নিবেশিত হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, তাঁর ইতিহাস লিখনের ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাবলীল এবং বিনীত। কোথাও উচ্চকিত কণ্ঠস্বরে তিনি বিশেষ মতপ্রকাশের চেষ্টা একেবারেই করেন নি। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নানা বাধা ও অসুবিধা তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। সে কথা ভাবতে গেলে আজ দুঃখ হয়। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে তাঁকে গবেষণা করতে দেওয়া হয় নি। কারণ তাঁর কোন 'তকমা' ছিল না। সুধীরকুমার নিজেই লিখেছেন, ''অর্ধশিক্ষিত ও দরিদ্র গ্রামবাসীগণ আমি ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য ভ্রমণ করিতেছি শুনিয়া আমায় তাঁহাদের অবস্থাতীত আদর - আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করেন। কিন্তু শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিগণের আবাসে যখনই গিয়াছি, তাঁহারা আমায় সহানুভূতি দেখানো দূরে থাকুক, এইরূপ বাক্যবাণে জর্জরিত করিয়াছেন যে, বহুবার আমি ক্ষোভে, দুঃখে ইতিহাস সংকলনের বাসনা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।''

তবে আশার কথা এই যে, তিনি তাঁর পথ থেকে সরে আসেন নি। তাঁকে চিঠি লিখে উৎসাহিত করেছিলেন হুগলি জেলার আরো এক বরেণ্য সন্তান ঐতিহাসিক হরিহর শেঠ। এডওয়ার্ড হ্যালেট বলেছিলেন— Approach of local history lies primarily through the "history at our doors." সুধীরকুমার দুয়ার থেকেই শুরু করেছিলেন অনুসন্ধান। ভূগোল তাঁর চেতনায় ছিল ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে। তিনি জানতেন, ভূগোল অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের সিদ্ধান্তকে পাল্টে দিতে পারে। এইচ. জে. ম্যাকিনডার ১৯০৪ সালে লিখেছিলেন 'The Geographical Pivot of History' নামে একটি বই। সুধীরকুমারের ইতিহাস লিখনে ভূগোলের স্পষ্ট প্রভাব সেই কথা মনে পড়ায়। নদী ও মানচিত্র তাই এত উল্লেখযোগ্য তাঁর ইতিহাস রচনায়। ম্যাকিনডার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভূগোলের পথ দেখিয়েছেন 'Democratic ideals & reality' বইতে। সুধীরকুমার তার সঙ্গে যোগ করেছেন সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ও নিম্নবর্গীয় জীবনের ইতিহাস এবং লৌকিক ইতিহাসের ব্যাখ্যা। ফলে আজ আঞ্চলিক ইতিহাসের রচনাধারায় সুধীরকুমার মিত্রের রচনা একটি model একটি প্রকল্প পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে গবেষকদের কাছে।